যুগান্তরে—
আলোর যুগ
"প্রকৃতির অনুশীলন সভা"
বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন
(S/59437) এর অন্তর্গত নয়।
?
বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন—
‘প্রকৃতির অনুশীলন সভা’

যুগান্তরে—

আলোর যুগ

বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন—

'প্রকৃতির অনুশীলন সভা'

Jugantare—
ALOR JUG
by Balak Brahmachari Sangathan—
Prakritir Anushilan Sava
165 Uchalpukuri (Charcharabari)
Mekhliganj, Coochbehar, PIN-735303

যুগান্তরে—
আলোর যুগ
সংকলন ও প্রকাশনায় ঃ বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন—
'প্রকৃতির অনুশীলন সভা'
১৬৫ উচলপুকুরী (চরচরাবাড়ি)
মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার, পিন-৭৩৫৩০৩

বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন
s/59437,1988 এর অন্তর্গত
সংগঠন এটি নয়।

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৩শে কার্ত্তিক ১৪২৭ সন (ইং-৯ই নভেম্বর ২০২০)

প্রচ্ছদ ঃ ধীরাজ রায়
বিনোদিনী স্টুডিও
রাণীরহাট, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার, ফোন-৭৮৬৪০৬৫৯১৬

অক্ষর বিন্যাস ঃ শ্রী উৎপল সিংহ রায়
নীলিমা প্রিন্টিং প্রেস, নেতাজীপাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি
ফোন-৯৮৩২৪৪৪০৭৫

যোগাযোগ ঃ সতীশ চন্দ্র রায়
১৬৫ উচলপুকুরী (চড়চড়াবাড়ী)
ডাকঘর-উচলপুকুরী, জেলা-কোচবিহার, পিন-৭৩৫৩০৩
মোবাইল-৯৯৩২৫৩৫১৯৪

মুদ্রণে ঃ 'বাবা মনোরঞ্জন প্রেস'
প্রোঃ-শ্রী সুবল চন্দ্র রায়
রাণীরহাট, কোচবিহার/মাগুরমারী, ধূপগুড়ি, ফোন-৯৯৩২৮৩৮০০২

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

সূচীপত্র

মেনে চলুন। মানুষকে ভালবাসুন, মানুষে মানুষে বিভেদ করবেন না।

COVID-19 এর লকডাউনে বিশ্বপ্রকৃতি (পৃথিবী) দূষণমুক্ত হচ্ছে। আসুন আমরাও সবাই এই লকডাউনে ভেদ-বৈষম্য, ঈর্ষা-হিংসায় ভরা আমাদের মনের দূষণমুক্ত হই। বিশ্ববাসী সবাই ভেদ-বৈষম্য ভুলে আসুন মহাপ্রকৃতির (পরমপিতার) নিকট প্রার্থনা জানাই, মোনাজাত করি, উপাসনা (আরাধনা) করি। COVID-19 এর মহামারীর সংক্রামন থেকে নিজেদের বাঁচাতে, পরিবার এবং বিশ্বপরিবারকে বাঁচাতে লকডাউন মেনে চলি, বাইরে বেরলে 'মাস্ক' পরি এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে অন্যের থেকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলি। অবশ্যই বিশ্বপ্রকৃতি সহায় থাকবেন। সমগ্র বিশ্বের করোনা যোদ্ধা— ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী, পুলিশ ও সংবাদকর্মীদের শ্রদ্ধা জানাই, সম্মান করি। ওদের সহযোগিতা করুন, দুর্ব্যবহার করবেন না। ওরা সবাই সমাজের খুব ভালো বন্ধু। আলোর যুগ-এর আলোয় সবকিছু আলোয় এসে পড়ছে, গোপন কিছু থাকছে না, থাকবে না। সুতরাং প্রকৃতির মাইর COVID-19 এর মারণ-মড়ক থেকে বাঁচতে-বাঁচাতে জাত-পাত, ভেদ-বৈষম্য ভুলে স্বচ্ছভাবে-যৌথভাবে সমাজের কাজ করলে দেশের মানুষ রক্ষা পাবে, বাঁচবে।*

আলোর যুগ-এর নতুন দিশা

মহাবিশ্বের মহানদের আহ্বানে এবং সত্যের উপাসক যোগী-ঋষি-সাধকগণের ভবিষ্যৎবাণীর মূর্ত্ত প্রতীক—সমগ্র বিশ্বের হিতাকাঙ্খী মহামানবশ্রেষ্ঠ, ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদ দর্শনের আবিষ্কারক ও পরিবেশক, মানব সমাজ বিজ্ঞানী, মহান শিক্ষক পরমপিতা বালকব্রহ্মচারী (বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)। তিনি সর্বকালীন ধর্মান্ধতা ও স্বার্থান্ধতাকে ঘোচাতে 'অগ্নিযুগ'-এ অবিভক্ত ভারতবর্ষের ঢাকা জেলার মেদিনীমন্ডলগ্রামে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর (১৩২৭ সন, ২৩শে কার্ত্তিক) মঙ্গলবার রাত ১০টা ২০ মিনিটে ঘোরতর অমানিশার ঘোর অন্ধাকারকে ভেদ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।এবং আলোর যুগ-বেদের যুগ-এর সূচনা করেন। মাতা—চারুশিলা দেবী, পিতা—সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পরমপিতা মহান বালকব্রহ্মচারী (বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) মহাসংস্কারক ও মহাপরিবর্তনের ধারক-বাহক এবং জীবধর্ম, মানবধর্মের প্রবর্তক। তাঁকে চিনতে পারবে কয়েকজন ঋষি (সমাজবিজ্ঞানী), কয়েকজন ঋষিকল্পপুরুষ (বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি) এবং কয়েকজন পার্শ্বচর (সহচর)।

পৃথিবী হলো জীবের শিক্ষাকেন্দ্র, সাধনাক্ষেত্র এবং কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রভূমি। এখানে যারা আসেন তাদের সবাইকে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক, শ্রেষ্ঠ, কাঙ্খীত ব্যক্তি বা যথার্থবলে প্রমাণ করতে হয়। এটাই এখানকার

নিয়ম। মহান বালকব্রহ্মচারীকেও শিশু কাল থেকে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোটি কোটি সন্তানের পরমপিতা হতে হয়েছে। পরমপিতা মহান বালকব্রহ্মচারী একসময় বলতেন—তোমরা হাটে যাও, বাজারে যাও, যাকিছু কিনো আলুটা-পটলটা, লংকাটা কিনলেও যাচাই কর, ঝাল আছে কি না। হাড়িটা-পাতিলটা কিনলেও তো বাজিয়ে নাও। সোনা কিনলে কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করা হয়, সোনাটা খাঁটি কিনা? তোমরা যারা আমার কাছে এসেছ, আমাকেও তোমরা বাজিয়ে নিও, যাচাই করে নিও। আমি আসল না নকল। নিয়মটা যখন আছে, সেই নিয়ম মতো চললে কাউকে ঠকতে হবে না। পাঁচকোটির বেশি মানুষ সরাসরি পরমপিতা মহান বালকব্রহ্মচারীর সান্নিধ্যে আসেন এবং দীক্ষা-দর্শন গ্রহণ করেন। পরমপিতা অবশ্য বলেছেন—দশকোটি মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। এরমধ্যে অনেকে বিরাটকে দর্শন করতেই এসেছিলেন। অনেকে কিছু চাওয়া-পাওয়ার আশায় এসেছিলেন। আবার অনেকে জীব যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এসেছিলেন। এরপর যারা রয়েছেন তারা সবাই মহান বালকব্রহ্মচারীকে অনন্ত মহাবিশ্বের আসল মালিক বলে চিনে নিয়েছে। তাই তারা পরমপিতার বিরাট কর্মযজ্ঞে সামিল থেকে পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, আদর্শ কর্মী সন্তান হতে চান। তারা, পরমপিতার—'বালকব্রহ্মচারী সংগঠন'-এর সন্তানদল সহ সমুদয় সংগঠন সমূহের শিক্ষার্থী-সন্তানকর্মীগণ। তারা সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদ দর্শন-এর একজাতি, একনীতি, একধর্ম, একরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে বা প্রতিষ্ঠায় সমূদয় দেশ, রাজ্য, জেলা, দক্ষিণবঙ্গ- উত্তরবঙ্গ, অসম সহ বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলগুলিতে সংগঠক সন্তানকর্মীগণ ধারাবাহিকধারায় জনজাগরণ, জনচেতনা কল্পে মহানাম 'রাম নারায়ন রাম' নাম প্রচার, বৈদিক গীতিআলেখ্য, বেদতত্ত্ব প্রচার, সাপ্তাহিক ক্লাস, পাক্ষিক সভা, মাসিক কড়া চাবুক আলোচনা সভা এবং প্রকৃতির আদর্শে জাত-পাত, ভেদ-বৈষম্যহীন নতুন মানুষ হয়ে 'নতুন মানুষের—নতুন সমাজ' বেদের সমাজ গড়ার পথে সবাই এগিয়ে চলতে চাইছেন।

পরমপিতা মহান বালকব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত 'বালকব্রহ্মচারী সংগঠন'-এর সন্তানদল সহ সমুদয় সংগঠন সমূহের সকল শিক্ষার্থী - সন্তান, কর্মী-সংগঠক ভক্ত-শিষ্যদের তিনি একাধিকবার অঙ্গীকার করিয়েছেন—বলেছেন—মনে রাখবে তোমাদের ধর্ম—আমার সাথে বল— আমাদের ধর্ম—বাস্তবভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানভিত্তিক, গণিতভিত্তিক ও সুরভিত্তিক। ভাব-উচ্ছ্বাস, গল্প-কল্পনা আমাদের ধর্ম নয়; মনে রাখবে। 'আমি কি করি দেখতে যেওনা, কি বলি তা খেয়াল কর।' 'গুরুর তত্ত্বধারার সাথে নিজেকে (নিজেদের) গুছিয়ে চলতে হবে।' 'গুরুকৃপা থেকে যেন বঞ্চিত না হও, সেদিকে সর্বদা সচেতন থাকবে।' 'সন্ধানী মন নিয়ে সত্যের সন্ধানে, তত্ত্বের সন্ধানে এগিয়ে চলতে হবে।'

পরমপিতা মহান বালকব্রহ্মচারী ১৯৯০ সালে সুখচর গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তাঁর অর্ন্তধান বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সংগঠনকে সময়মতো তা জানাবার পরামর্শ দেন। পরমপিতার ঘরানাটা কে বহন করবেন এবিষয়ে যা বলেছেন—শ্রী শ্রী ঠাকুরের 'ঘরোয়া আলাপ' নামক পুস্তিকা প্রকাশক— গৌতম চৌধুরী ও দেবাঞ্জলি কুন্ডু, মুদ্রক-সরস্বতী প্রিন্টার্স, কোন্নগর, হুগলি। দুটি আলোচনা। (১) সুখচর, ১২/০৯/১৯৯২, রাত্রি বেলা চাতালে। (২) লেকটাউন, ২৬/১২/১৯৯২, শনিবার। উল্লিখিত 'ঘরোয়া আলাপ' দুটির মধ্যে ২৬/১২/১৯৯২ ইং তাং-এর ঘরোয়া আলাপের বিশেষ অংশগুলি সকলের অবগতির জন্য— "...বাবনকে বলেছি ছোটো বাগানে যাওয়ার কথা—এক কথায় চলে গেছে। আমি খুব খুশি হয়েছি। ওকে বাড়ির এই ভিড়ের থেকে একটু নিরিবিলিতে রাখবো বলেই ছোটো বাগানে পাঠিয়েছি। ওকে আমি বাড়ির কোনো কাজের মধ্যে রাখিনি— বলেছি, শুধু পড়াশোনা করবে, তোমার অন্য কোন কাজ নেই, তবে একটা কাজ দিয়েছি আমার জামা কাপড় ইস্ত্রি করার। .... ওর মাথাটা খুব ভালো, এরকম দেখা যায় না—আমাদের গ্রামদেশে এরকম মাথাকে দাশু মাথা বলে। সেদিন বাবনের মা এসেছিলো, আমি বললাম যে, বাবন গৌরের মতো বা তোর মতো হয়নি—ও হয়েছে আমার মতো। ওর মা খুব খুশী হয়ে গেছে।

বাবনকে দেখলে আমার নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। প্রদীপের বোনটা তো ওর জন্য পাগল—আমার ইচ্ছা ছিলো না ও সাধারণের মতো সংসার করুক। আমি আটকে দিয়েছি। ওর সাথে কলেজে পড়ে একটা মেয়ে, বেশ সুন্দর দেখতে, বাবনকে খুব ভালোবেসেছে। আমি মেয়েটাকে বললাম, বাবন যেখানে আছে সেখান থেকে ওকে নামাতে ইচ্ছা করে না। মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতী, অল্পতেই বুঝে গেছে।

বাবনের মতো একজনকে আমি খুঁজছিলাম, তাই হয়তো প্রকৃতি থেকে ওকে পাঠিয়েছে। ওর চোখ দুটোই অন্য রকম। ও যেন এখানকারই না, অন্য কোন এক যুগ থেকে কিভাবে কিভাবে আমার কাছে এসেছে। সেদিনও সুখচর থেকে আসার সময় বাড়ির মেয়েদের বললাম, মাঝে মাঝে বাবনকে ডেকে এনে আমার কথা শুনবি। আগে জিজ্ঞাসা করবি, ওর পড়াশোনা হয়ে গেছে কিনা, তারপর যদি ওর সময় থাকে, তাহলে ওকে ডেকে এনে ক্লাস করবি। ওকে জিজ্ঞাসা করবি, ও কি ভাবে ? ও কি চিন্তা করে ? ওকে এখানকার বেদপ্রচারে রাখার ইচ্ছা নেই, মাঝে মাঝে যেটুক খুশী করলো। কারণ ছাত্র ও কী পড়াবে ? ও মাস্টার পড়াতে এসেছে—ও হলো মাস্টারদেরও মাস্টার। ওকে নিয়ে আমার একটা বড় পরিকল্পনা আছে।"

উল্লিখিত 'ঘরোয়া আলাপ'-এর বিশেষ অংশগুলির রেখা দ্বারা চিহ্নিত

কথাগুলো যদি গভীরভাবে পর্যালোচনাপূর্বক বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে ইহাই প্রতিভাত হবে যে, পরমপিতা কলকাতার ১৫৫ পার্কষ্ট্রীটের বাড়িতে বিগত ১৯৬৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০সে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘরোয়া আলোচনায় কলমের গাছরূপী সন্তানের বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন, তা একমাত্র কলমের গাছরূপী সন্তান ড. শিবশংকর দত্ত (বাবুন বা বাবন)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এসম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

১৪/০৯/১৯৬৭ ইং তাং সময় রাত্রি সাড়ে এগারোটা। পরমপিতা ঘরোয়া আলোচনায় বলেন, '...রাত্রিবেলা বিশ্বপ্রকৃতি থেকে একটা অনুরোধ আসলো। খুব ছোটবেলায় যখন কাজে বসতাম তখন এমন কেউ কেউ আসতো, হঠাৎ দেখি তারা সেদিন এসে হাজির। এসে প্রণাম জানিয়ে বললো—আপনি যদি খুশি থাকেন, তবে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে। আপনার মতো তিনজনকে তৈরী করতে হবে। এইটুকু বলেই চলে গেলো।... মনেহয়, প্রকৃতি থেকে যখন অনুরোধ এসেছে, প্রকৃতি থেকেই কাউকে হয়তো আমার কাছে পাঠানো হবে।...কলমের গাছ খুব অল্পদিনের মধ্যে পরিণতি পায়, কারণ direct ঐ গাছের অংশ ওর মধ্যে থাকে।.... কলমের গাছ যেভাবে তৈরী করে, সেভাবে যদি কাউকে তৈরী করতে পারি, তবে সে খুব দ্রুতগতিতে আমার বুঝগুলি বুঝে নিতে পারবে।'... যেকোন stage-এরই হোক না কেন, যতো উঁচুতেই কোন যোগী থাকুননা কেন, সব stage-এর উপরে ও মাস্টারী করতে পারবে।...

আমার কলমের গাছ যে হবে, সে শুধু সাধকদের কেন আরও উপরে যারা চলে গেছে তাদেরও উপরে অবস্থান করবে।.... কলমের গাছ হলো গিয়ে মাস্টারদের মাস্টার। বিশ্বের....পথ অনন্ত পথ—এই পথ অনন্তকালের। পথ চলতে চলতে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন পথিক হতে পারে। কলমের গাছ সেই অসুবিধা থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দেবে।... আমার কলমের গাছ যেহেতু আমার সহজাত চেতনাতেই বড় হবে, তাই সে তখন প্রকৃতির সেই সংস্কারমুক্ত অতি সহজ পথের বার্তা যোগীদের জানিয়ে দিতে পারবে। এরফলে যে কাজ করতে তাদের হয়তো কয়েকহাজার জন্ম লাগতো, সেই কাজ ওরা এক জন্মেই সেরে ফেলতে পারবে। তারজন্য ওরা কলমের গাছের আশায় আকুল-ব্যাকুলভাবে বসে আছে, আর আমার কাছে দিবা-রাত্র প্রার্থনা জানাচ্ছে, কবে আমি কলমের গাছ করে কাউকে পাঠাবো।...

প্রকৃতির আপন নিয়মেই হঠাৎ হঠাৎ কারুর মধ্যে বিশ্বের সুর খুব সহজে ধরা পড়ে, তখন universe থেকে তাদের খুব বড় status দেওয়া হয়। কলমের গাছও সেরকম খুব বড় status-এর অধিকারী হবে। বড় বড় যোগীরা তাকে ঈশ্বরের মতো দেখবে। আমি যেমন এই বিশ্বকে represent করছি ঠিক সেরকম

আমার কলমের গাছও আমার representative হয়ে তাদের কাছে যাবে। ... আমার সত্যিকারের রূপটা, আমার আসল চিন্তাটা ওর থেকেই সবাই জানতে পারবে।... তার কাজের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন পথ বের হয়ে আসবে। বড় বড় যোগী-ঋষিরা তার নির্দেশিত পথে চলবে।.... বেদ প্রচারের কাজে ওকে বেশী রাখা হবে না। তবে মাঝে মাঝে যদি নিজের খুশিতে ও কিছু করে, সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ ওতো পথ দিয়ে চলতে আসছে না, ও পথ তৈরী করতে আসছে। যারা ওর সান্নিধ্য পাবে তাদের বিশেষ ভাগ্য—এইভাবেই বলতে হবে।...

আমার কলমের গাছ হবে বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ। .... বিশ্বের সেই আদিমতম সুরের সন্ধান নিয়ে আসবে আমার সেই সন্তান, যাকে আমি কলমের গাছ করে তৈরী করবো, সকল সমস্যার অতি সহজ সমাধান ওর কাছ থেকে নিতে বিশাল বিশাল মহাপুরুষেরা আসবে।... যারা উঁচুতে উঠে গেছে, তাদের চিন্তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়। তারা এই সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের সাধনায় ডুবে আছে, সেই সাধনার সুর আমার কলমের গাছ থেকে তারা জেনে নেবে।.... যারা খুব উঁচুতে উঠে গেছে, তারাই ওকে খুঁজে বের করে নেবে। ... পৃথিবীতে যারা সাধনা করে বড় হয়েছে, তারা যেখানে শেষ করেছে— আমার সেই সন্তান, আমার সেই কলমের গাছ শুরুই করবে তারও অনেক উপর থেকে। .... আমার আধ্যাত্মিক শক্তির উত্তরাধিকারীতো আমার সন্তানই হবে।...আমার সেই সন্তান যে কলমের গাছ হয়ে আসবে, তাকে ভালোবেসে কতজন যে, আমার কাছে পৌঁছে যাবে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অনেকেই ওর আশায় বসে আছে। .... আমার কলমের গাছ বিশ্বপ্রকৃতির এক আশ্চর্য কাজের জন্য আসছে।... অনেক দিনের অনেক চিন্তা ভাবনার একটা শেষ result এই কলমের গাছ। ... বিশ্বপ্রকৃতি থেকে অনন্ত শক্তির উত্তরাধিকারী হয়ে সে আসবে। তার আমার একটাই উদ্দেশ্য—অনন্ত সৃষ্টির মহান সফলতার চূড়ান্ত যে ফল, তার দিক নির্দেশ করা" (দ্রষ্টব্যঃ পরমপিতার ঐশী ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিফলন—কলমের গাছ তৈরী প্রসঙ্গ—দেবেন্দ্র নাথ বর্মা, পৃষ্ঠা নং-১,৩-৪,৫-৬ এবং ৭-৮)।

বিগত ৩০/০৯/১৯৬৭ ইং তাং এর ঘরোয়া আলোচনায় পরমপিতা কলমের গাছ তৈরী প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার বার্তা আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরমপিতার কথিত কলমের গাছরূপী সন্তানের জন্ম ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ এর অব্যবহিত পরে ৩৮ দিনের দিন পরমপিতার কাঙ্খীত সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় শিশুর দাদু (সুধীর বিশ্বাস)-এর বাড়িতে তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার বাবুপাড়ায়। ১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর (১৩৭৪ সন ২৩শে কার্ত্তিক) মঙ্গলবার ছুট পূজার দিন বিকাল ৩টার সময় বিশ্বাস বাড়ির জ্যেষ্ঠা কন্যা রত্নগার্ভা স্বপ্না দত্ত কাঙ্খীত নবজাতকের জন্ম দেন।পিতা জলপাইগুড়ি

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সনামধন্য বেদকর্মী গৌরগোপাল দত্ত। সেই শিশু সন্তানের নাম শিবশঙ্কর (বাবুন)। শিশু বাবুনের পিতা গৌরগোপাল দত্ত মহাশয় ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাবুনকে কার্শিয়াং-এর তদকালীন খুব নামকরা সরকারি ডাউহিল কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে ভর্ত্তি করান। সেসময় শিশুর বয়স চার বছর চার মাস। ভর্ত্তি হওয়ার সাথে সাথে হোস্টেল না পাওয়ায় প্রথমত মিসেস ম্যানন নামে এক ভদ্রমহিলার কাছে থাকতেন বাবুন। তারপর ভিক্টোরিয়া স্কুলের (ডাউহিলের ছেলেদের স্কুলে) অফিসে কর্মরত একজন সহৃদয় ভদ্রলোকের বাড়িতে বেশ কয়েকমাস থেকে একবছর পর হোস্টেলে চলে যান। বাবুন ডাউহিলে চার বছর পড়াশোনা করেছিলেন। লোয়ার কেজি, ক্লাস ওয়ান, টু এবং থ্রি। ১৯৭৬ সালে জানুয়ারী মাসে বাবুনকে ডাউহিল স্কুল থেকে শিলিগুড়ি নিয়ে এসে শিলিগুড়ি সেবক রোডের ডন বসকো স্কুলে ক্লাস থ্রি-তে আবার ভর্ত্তি করানো হয়। বাবুন শিলিগুড়ি ডন বসকো স্কুলে দুই বছর (১৯৭৬-১৯৭৭) পড়াশোনা করেছিলেন। (ক্লাস থ্রি ও ক্লাস ফোর)। ওই স্কুলে বাবুন বার্ষিক পরীক্ষাতে একটাতে প্রথম ও আরএকটাতে দ্বিতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। এরমধ্যে—বিগত ২০/০১/১৯৭৫ ইং তাং-এ জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর হাইস্কুল-এর মাঠে আহূত সভায় শ্রীশ্রী ঠাকুর ধ্যানস্থ অবস্থায় তাকে দীক্ষা দেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৭ বছর ২ মাস ১৫ দিন। এরপরে তাকে কোচবিহার শহরের নিউটাউনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত বিবেকানন্দ হাইস্কুলে ভর্ত্তি করানো হয় এবং বিবেকানন্দ হাইস্কুল থেকে ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোচবিহার জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শ্রী শিবশঙ্কর দত্ত মহাশয়ের মন-প্রাণ শ্রীশ্রী ঠাকুর বালকব্রহ্মচারী মহারাজের দর্শন লাভের আকাঙ্খায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। তিনি পিতার সঙ্গে ১৯৮৪ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার অর্ন্তগত সুখচরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী পরমপিতার 'শ্রী বালকব্রহ্মচারী ধাম'-এ গমন করেন। শ্রী শিবশঙ্কর দত্ত মহাশয়কে দেখে পরমপিতা খুব খুশি হন। পরমপিতা শতপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে নিজের কাছে রেখে দেন। 'শ্রী বালকব্রহ্মচারী ধাম'-এ আশ্রয় লাভ করে পরমপিতার আদর-যত্ন ও তত্ত্বাবধানে শ্রী শিবশঙ্কর দত্ত মহাশয়ের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

শ্রী শিবশঙ্কর দত্ত মহাশয় কৃতিত্বের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এস.সি. পাস করেন Indian Statistical Institute (ISI) থেকে এবং পি.-এইচ.ডি. ডিগ্রীও লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, 'ফিলসফিক্যাল ইমপ্লিকেশনস্ অফ্ কোয়ান্টাম মেকানিকস্' (Philosophical Implications of Quantum Mechanics)। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

পরমপিতার সান্নিধ্যে ড. শিবশঙ্কর দত্ত মহাশয় পরমপিতার তত্ত্ব-দর্শন-এ

শিক্ষিত ও পরিশীলিত-পরিস্নাত হয়ে একজন বেদজ্ঞ মহাপুরুষে রূপান্তরিত হন। পরমপিতা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রেখে আলাদাভাবে তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে মনের মতো করে তৈরী করেছেন। ড. শিবশঙ্কর দত্ত মহাশয় পরমপিতার ঐশী ও আধ্যাত্মিক শক্তির আলোকে দেদীপ্যমান। বর্তমানে তিনি পরমপিতার তত্ত্বাদর্শ—অনন্ত মহাকাশ তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে নিমগ্ন আছেন। তাঁর বিচরণের ক্ষেত্র হল পাহাড়ের ঘন অরণ্য ও কন্দর থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর জল-স্থল ভাগের সর্বত্র। তিনি পাহাড়ে গমন করে সর্পবেষ্টিত শিবের সাধনার আসনে বসেছেন এবং পাহাড়ে প্রতি ১২ বছর অন্তর সাধকদের আয়োজিত বিরাট সভা (বিশেষ সভা)-য় বিচারকের ফুলের মালায় শোভিত ফাঁকা আসনেও বসেছেন।

পরমপিতা গত ২২/০৯/১৯৬৭ ইং তাং-এ ঘরোয়া আলোচনায় বলেছেন, "আমার কলমের গাছ যে হবে সে.... হবে.... একজন Universe-এর মহাগবেষক যে Universal Mathematics ... এর মধ্যে ডুবে থাকবে।" ....ড. শিবশঙ্কর দত্তই পরমপিতার একমাত্র সন্তান যিনি উল্লিখিত গুণ-যোগ্যতা ও ক্ষমতা-র অধিকারী, যাঁকে পরমপিতা কলমের গাছরূপে তৈরী করেছেন। পরমপিতার তত্ত্ব, শক্তি, ইচ্ছা ও চিন্তা তাঁর মধ্যে যে প্রতিফলিত (reflected) হয়েছে, তা তাঁর আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কার্যকলাপ এবং ঘরোয়া ও প্রকাশ্য সভায় পরিবেশিত বক্তব্যে ব্যঞ্জিত। তাঁর মুখমন্ডল পবিত্র দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। পরমপিতার নিগূঢ় তত্ত্বাদর্শ তিনি সহজ ও সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করেন, যা সকলের প্রাণে সাড়া জাগায়। পরমপিতার স্নেহধন্য কলমের গাছরূপে তৈরী এই সন্তান পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গুরুজন, বেদকর্মী এবং জনগণ-এর পরিমন্ডলে থেকেও অন্য জগতে.... বহুদূরবর্তীস্থানে অবস্থান করেন, যা পৃথিবীর মানুষের কাছে রহস্যময়, অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়। তিনি সর্বপ্রকার হিংসা, ঈর্ষা ও নিন্দার বহু উর্দ্ধে অবস্থান করেন— কুনোরকম মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি অমেয় ঐশী ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী।

প্রকৃতির অমোঘ আকুতি এবং পরমপিতার কলমের গাছ তৈরীর ইঙ্গিত অভিলাষ যেন পরমপিতার শক্তিতে শক্তিমান.... পরমপিতার আলোতে আলোকিত ড. শিবশঙ্কর দত্ত-এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

পরমপিতা ৩০/০৯/১৯৬৭ আলোচনায় বলেছেন—আমার কলমের গাছ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে অনন্ত শক্তির উত্তরাধিকারী হয়ে সে আসবে। তার আসার একটাই উদ্দেশ্য—অনন্তসৃষ্টির মহান সফলতার চূড়ান্ত যে ফল তার দিক নির্দেশ করা। একদিকে আমার রেকর্ড চলছে, আরেকদিকে তাকে তৈরি করার দায়িত্ব।.... তার ভূমিষ্ঠ হবার বার্তা আসছে। আমি চাইবো বিশ্বপ্রকৃতির ইঙ্গিত অনুযায়ী তাকে যতটা সম্ভব ততোটা আড়ালে রাখতে। তাকে বুঝতে দেওয়া চলবে না সে কি হতে চলেছে। তাকেও যেমন বুঝতে দেওয়া চলবে না সে কে, অন্যদেরও বুঝতে দেওয়া হবে না। কারণ তাতে কাজের পথে তৈরির পথে বিঘ্ন আসতে পারে। তবে কেউ যদি তাকে চিনে নিতে পারে সেখানে কিছু বলার নেই। তবে খুব সাবধানে তাকে রাখতে হবে।.... সেইভাবেই তাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। যতটা মনে হয় ৭ই নভেম্বর ১৯৬৭ থেকে ১২/০৯/১৯৯২ পর্যন্তও পরমপিতার অতি কাছের যারা অর্থাৎ আবাসিক সহচর-সহচরিরাও recommend করা ব্যক্তি বা কলমের গাছরূপী সন্তানকে কেউ চিনতে পারেননি। অথচ কলমের গাছরূপী সেই সন্তান ১৯৮৪ সাল থেকে সুখচর ধাম-এর বাড়ির আবাসিক হয়েছিলেন। শিশু কিশোর কালেও এই সন্তান কমপক্ষে বার তিনেকতো হবেই সুখচর বাড়িতে থেকে খেয়ে গেছেন। তাকে কেউ খুঁজলেও কেউ খুঁজে পান নাই। ২৬/১২/১৯৯২ তারিখের লেকটাউনের ঘরোয়া আলাপে পরমপিতা নিজে খোলসা করে বলে দিয়েছেন—তার recommend করা ব্যক্তি বা কলমের গাছরূপী সন্তান-এর নাম। যাকে আনা হয়েছে কেবল অনন্তসৃষ্টির মহান সফলতার চূড়ান্ত যে ফল তার দিক নির্দেশ করার জন্য। তিনি হলেন মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. শিবশঙ্কর দত্ত (বাবুন)। এই কলমের গাছ সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরমপিতা বলেছেন— ...."সে আপনভোলা শিশুর মতো পৃথিবীর পথে পথে চলে ফিরে খেলে বেড়াবে। যে পথ দিয়ে সে যাবে, তার চলে যাবার পরে পথের ধুলোকে প্রণাম করে দেবতারা পর্যন্ত ধন্য হয়ে যাবে।" তাই বলছিলাম—যদি পথ হারিয়ে ফেলেন—খুঁজুন তাঁরে—পেলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। পরমপিতার নিকট আমাদের প্রার্থনা—যিনি বিশ্বপ্রকৃতির সকল সমস্যার সমাধান করতে এসেছেন। আমরা তাঁকে আহ্বান করি, শ্রদ্ধা জানাই—তিনি যাতে পথ হারাদের সবাইকে (আমাদেরকে) সঠিক পথের দিশা দেখান, কামনা করি।

পৃথিবীর পথে পথে চলে ফিরে খেলে বেড়াবে, যে পথ দিয়ে সে যাবে, তার চলে যাওয়ার পরে সেই পথের ধুলোকে প্রণাম করে দেবতারা পর্য্যন্ত ধন্য হয়ে যাবে। (এই সময় শ্রীশ্রী ঠাকুরের মা ও মাসী শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হওয়ায় আলাপ বন্ধ হয়।)

বালকব্রহ্মচারী ধাম

সুখচর

১৯৯০

১৯৯০ সালে পরমপিতা সুখচরধামের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিজের অর্ন্তধান প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন যা সকলের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা হল।

আমার কর্তব্য হল যে, সাময়িক ৭০ বছর ৮০ বছরের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আমরা যেন অন্ধ হয়ে না যাই। আমরা চাই, চিরকাল যাতে শান্তি পাই, চিরদিনের শান্তির পথ পরিস্কার করার জন্য যা দরকার, তা করার চেষ্টা করছি। সেই চেষ্টার জন্য যে জন্মটা এখানে আমার হয়েছে, তার রেকর্ডটা সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন আছে এবং তারজন্য আমি খুশি হয়েছি। বেশকিছু সন্তানদের নেওয়ার ব্যবস্থার চেষ্টা করছি। আমি চাই এখন যেভাবে আছি, এমন একটা জায়গা, এমন একটা স্থান ক্রিয়েট করা হবে—যেখানে আবার আমরা সবাই গিয়ে, একত্রিত হয়ে, আবার ঠিক এমনি করে এই চেহারায়, যার যা যে চেহারা আছে, যেভাবে যেই জায়গায় যার দর্শন হয়েছে, সেইভাবে আবার আমরা মিলিত হয়ে, আবার সেইদিনকার কথাগুলো, পুরনো কথাগুলো সেখানে বলাবলি করব।

আমি সেইখানেই অপেক্ষা করব। আমি এইটুকু ঠিক করেছি, তোমাদের যাদের যাদের আমি দীক্ষা দিয়েছি, আমি অন্যখানে আর কোথাও যাব না, আমি ঠিক সেই জায়গাই থাকব—যতক্ষণ না পর্যন্ত, যতদিন না পর্যন্ত, সব সন্তান এক জায়গায় ঠিক না হবে—একজায়গায় না আসবে—ততদিন পর্যন্ত তোমাদের সাথেই জড়িত থাকব, অন্যভাবে। সুতরাং তাতে তোমাদের ভাববার কোন কারণ নাই।

আজকে তোমরা ঘরে বসে আছ, জপে বসে আছ, চুপ করে জপ করছ, ধ্যান করছ, আরো যা কিছু করছ, আমি উপস্থিত হলাম, গেলাম, মিষ্টি

খেলাম, জল-টল খেলাম, চেয়ে নিলাম, কথাবার্তা বলে দিয়ে যাব—এই অবস্থা মাঝে মাঝে হবে। বেশীক্ষণ থাকা যাবে না, বেশী কথা বলা যাবে না, দু-চারটে কথা বলে দিয়ে আসব। তখন তোমরা দেখবে, তোমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হবে, তোমরা এইটুকু আশ্বস্ত হবে যে, আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। যার যে সময়টুকু আছে সেটাতো এখানে কাটাতেই হবে। কাটিয়ে আবার সবাই এক জায়গায় একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে—সেখানে কোন রোগ-শোক নাই, ব্যথা-বেদনার উর্দ্ধে, এখানকার কুনো ঝঞ্ঝাট নাই, কারও কোন বক্তব্য নাই, বিবাদ নাই, বিভেদ নাই। আমরা স্বচ্ছ পবিত্রভাবে আনন্দে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারব। তারপর সেখান থেকে আমরা পরবর্তী স্তরে যার যার কর্ম্ম অনুযায়ী—পরবর্তী অধ্যায়ে—পরে সেটা ঠিক হবে।

সেইভাবে তোমরা জেনে রেখে দিও, রেডি রেখে দিও। কখন কোন সময় আসি, তোমরা নিশ্চই ভয় পাবে না, দৌড়ে পালাবে না আমাকে দেখে। আমার মনে হয় খুশীই হবে, আনন্দই পাবে। তোমাদের সাথে যে আলাপ করছি আজকে, সেদিন সেটা মনে হবে। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ, খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ, পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছ। চলে গেলাম, আশীর্বাদ করে এলাম, তোমাদের কাছে থেকে ফল-টল নিয়ে গেলাম। সুতরাং ভাববার কোন কারণ নাই। কিন্তু রোগের যন্ত্রনাটাতো আমার হাতে নয়। যন্ত্রনাটা যদি তোমরা লাঘব করাতে পার, তোমরা ঔষধ দিতে পার, চিকিৎসা করাতে পার, আমি সেটা গ্রহণ করব। আমি ভাল হতে চাই না তা নয়; ভালো হতে চাই। তোমরা যদি করতে পার আমার কোন আপত্তি নাই। আমি মৃত্যু কামনা করি না। কিন্তু যন্ত্রনার উপশম করার জন্য তোমরা যদি কিছু করতে পার, আমার আপত্তি নাই। আমার চেষ্টা শেষ হয়ে গেছে কিছুতেই আর আটকাতে পারছি না, কোন দিক থেকেই না; তবু আমি চেষ্টা করছি। আরএকটু কাজ বাকী ছিল সেই কাজগুলো শেষ করার জন্য। সুতরাং তোমরা সেইভাবে চলবে।

যার যার উপর যে আদেশ জারি করা হবে, সে সেইভাবে, সেই আদেশ যেন তোমরা পালন করে চল। এইটুকু করবে না, যে ঠাকুরতো আর নাই হামসে হাম, আমরা সব করেঙ্গা—দেখাইবা, সে নয়। ধীর, স্থির, নম্র চিত্তে আদেশগুলো পালন করে যাবে। আমি শুধু দেখবো তবেই আমি খুশী হব সবচেয়ে। সব ঘরে সব জায়গায় নাম, গান, কীর্ত্তন চালাবে। সব সুন্দরভাবে কাজ করবে। সবার সাথে সবাই আন্তরিকতা বাজায় রাখবে এবং মাঝে মাঝে আমি যে দেখা দেব— এটা তোমরা প্রত্যেকেই টের পাবে, অনেকেই টের পাবে, অসুবিধার কোন কারণ নাই। লোকে বিলাতে গিয়াতো থাকে। একমাস, দুই-চার-পাঁচ বছরের জন্য যায়। আমি যদি ফরেন-এ যাই, ফরেন-এ গিয়া যদি আমি আবার তোমাদের সঙ্গে

দেখা দেই তাহলে ভাববার কোন কারণ নাই। আসলাম, দেখা করলাম, খাওয়া-দাওয়া করে গেলাম। তোমরা একটা আসন করবা, জপ-তপ করবা কিন্তু আদেশ অমান্য করবা না; এটাই বড় কথা। কথার কথা বলছি, দুঃখ করবার কিছু নাই। মনে কর রাস্তা দিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আমি যদি তোমাদের কাছে বসে থাকি, বলি—কি কেমন আছ.....কিছু খাবার এনে দে, এতে আপত্তির কি আছে? পাচ্ছ তো তুমি। একটা পা কেটে যদি ফেলে দেওয়া হয়, সেই পা-টা পুড়াচ্ছে, সে তো দেখবে। হরিবোল করে নিয়ে যাচ্ছে আর তোর কাছে আইসা যদি বসে থাকি তাহলে আপত্তি কি আছে বল? আপত্তির কিছু আছে? আমি তোর পাশে বসে আছি, কথাবার্তা বলতেছি, পাচ্ছিসতো তোরা।

(মেয়েদের কান্না)। কথাগুলো শোন, বুঝবার চেষ্টা কর। সাথে সাথে থাকব, মাঝে মাঝে দেখা দেব। কথাগুলো শোন। যখন নিয়ে যাব, কানে কানে যেন কথা বলতে পারি। (মেয়েদের কান্না) কথা বলতে দে। কথাগুলো যদি বলি আপত্তির কি আছে? আদেশটা শোন, যাদের যা বলে যাব—কাঁটায় কাঁটায় সে সেইভাবে চলবে । এখনও চলবে— পরেও চলবে। আদেশের অমান্য কেউ কোরনা—এটাই আমার শেষ কথা। (আবার কান্না) আস্তে, আস্তে—তোরে একটা ভার দিয়ে যাব। রান্না করিস খেয়ে যাব। যেতে চাস তো, যদি যেতে চাস চুপ করে থাক্।

প্রত্যেক জায়গায় নেওয়ার— চাঁদে গেলে তো আর ঠেলাগাড়িতে নেওয়া যায় না; তার পথ আলাদা। চাঁদে যাওয়ার পথ তো আলাদা—আমার যে একটা চাঁদ আছে, আমার জায়গায় আমি যে তোদের নেব, আমি যে তোরে নেব, সেই জায়গাটা আমার ঠিকঠাক করতে হবে তো? এতগুলো লোক যাবে, এতগুলো সন্তান যাবে, তাদের ব্যবস্থা করা, তাদের গোছানো, তাদের সুন্দর মত থাকা। সুন্দরভাবে থাকবে। তারা প্রত্যেকে তো এক এক জন অনেক বড় বড় হয়ে যাবে। সুন্দরভাবে থাকবে, আমার কাছে থাকবে, আমার সঙ্গে মিশে-টিশে থাকবে। সেখানে সব করবি। মাঝখানে কয়েকটা বছর; বেশীনা, তারপর আস্তে আস্তে সব নিয়ে যাব, তাড়াতাড়ি নিয়ে যাব, কয়েক বছরেই নিয়ে যাব। (মেয়েদের কান্না) আইয়া যদি দেখা দেই তোরে (মেয়েদের গলা, কাম নাই দেখা দেওয়ার) যে জামাটা দিয়া দিবি, সেই জামাটাই পরে আসব।(মেয়েদের গলা—তুমি ভাল থাক তাহলেই হবে—কান্না)। কথাই যদি না বলতে পারলাম তাহলে কি করে হবে? আমার ঘটনা যেইরকম সেই কথাই তো বলব। দৈব্যের কথা তো বলব। আমি মানুষটা হলাম দৈবের, কথা বলব কি— এই মার্কেটের কথা বলব? আমি যেই দেশের লোক, সেই দেশের কথাই তো বলব।

আমি আইলাম, গেলাম—বাচ্চা বয়স থেকে, দুই বছর বয়স—

কলাবাগানে গিয়ে বসে আছি। বাবা কানে ধরে নিয়া আইলো। তিন বছর বয়সে চৌকির তলায়, খাটের তলায় গিয়া বসি। বাবা বলে— দ্যাখছ, তোমার পোলার কান্ড চকির তলায় বসে আছে। মায়ে বলে— কি করব, ও কি চিন্তা করে ওই জানে। তারপর ধমক দিয়া উঠায়ে আনল। বিছানার মধ্যে বসে আছি ঘন্টার পর ঘন্টা, একুশ ঘন্টা, বাইশ ঘন্টা বসা। তারপর বেড়ার ঘর করলাম চার বছর বয়সে। ছবি আছে। পাঁচ বছর বয়সে আনন্দমাষ্টার আইসা দীক্ষা নেয়। চিন্তা করে দেখ। বলি—মাষ্টার মশায়, এইভাবেকি চলবো ? এই পাঠশালায় কত মাষ্টার আইলো, কত গেল, আপনিও যাবেন। এইভাবে চলব না। কি করতে হইব ?—বসেন, কাম করেন। চিনেন আত্মাটারে চিনেন ? তারপর চার বছর, ছ বছর, আট বছর বয়সে বড় স্কুলে ভর্ত্তি করে দিল। মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করল—বলতো 'নীতিসুধা' বানান কি ? বলি— স্যার, আপনি তো জানেন স্যার, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন ? ছেলে ভাল—ভর্ত্তি করে দেন। ভর্ত্তি করে দিল। ভর্ত্তি করে দিয়ে বাবা যখন যায় কাঁদতে কাঁদতে যায়। আমি আবার ছুটে গেছি বাবাকে ধরতে। বাবাকে বলি—বাবা কেঁদনা, কাঁদছ কেন ? মাষ্টারমশায়কে বলি, বাবায় কাঁদতাছে, আমি যাই, আচ্ছা যাও। বাবায় বলে, তুই চলে আইসা পরলি—মাষ্টারমশায়ের মত নিয়া আসছি। কি কইলি ? কইলাম, বাবায় কাঁদতাছে, আমি যাই। (মেয়েদের কান্না) অন্য সবাই বলছে বড্ড ডিস্টার্ব করছ, তোমার কথায় কি সব হয়ে যাবে ?

আমি আসছি যে দেশ থেকে, সেই দেশের বাস্তব কথা আমাকে বলতে দাও। একথাতো গল্পকথা নয়, এটা বাস্তব কথা; একথা বলিনা সাধারণতঃ। যে দেশের বাস্তব কথা আমি বলছি সেই দেশে যাওয়াটা ভাগ্যের দরকার। সাধনা করে যেতে পারে না, অনেক জপ-তপ-এর দরকার। এটা সম্ভব নয়, কয়েকশ জীবনেও সম্ভব নয় ঐ জায়গায় গিয়া পৌঁছানো। সেই পৌঁছানো, অতি সহজে যদি সেখানে পৌঁছে দেওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারি—এবং সেটা করা হবে। অতি সহজেই সেখানে তোরা যেতে পারবি। সেটা যদি করে নিতে পারি তাহলে বুঝবি কত ভাগ্যবান-ভাগ্যবতি তোরা। তোরা ভাবতেই পারবি না কত সুন্দর প্লাটফর্ম তোমাদের জন্য করে দেওয়া হবে। যার জন্য, যার উপর যেই আদেশ বা আইন জারি করা হবে সে সেইভাবে সেই আদেশ বা আইন ঠিকমতো পালন করবে কিন্তু এই আদেশ অমান্য করবার জন্য কতগুলো বিরুদ্ধ শক্তি সবসময় ক্রিয়া করবে, এইটুকু আমি জানিয়ে দিলাম। বর্তমানেও চলছে, পরে অবর্তমানে আরও বেশি চলবে। যাতে ঐ গদিটা না পাও, ঐ পথটা না পাও। আমি যে আদেশ করে গেছি, সেই আদেশ মতন তোমরা যাবেই। একমাত্র নষ্ট করতে পারে, আদেশ অমান্য করিয়ে তোমাদের যদি অন্য পথে নিতে পারে। সেই পদটা তবেই নষ্ট করতে পারবে। তাছাড়া, অন্য কিছুতেই নষ্ট করতে পারবে না। তোমাদের পদ

পাওয়া হয়ে যাবে। পাসপোর্ট শেষ। কিন্তু একমাত্র নষ্ট করতে পারে, বিরুদ্ধ শক্তি যদি তোমাদের বিপথে এমন পথে ভুল বুঝিয়ে, এমন ভুল বুঝাবে তোমাদের যদি ঐটাকেই সঠিক মনে করে সেই পথে চলে যাও তবেই বুঝবে তোমাদের একেবারে শেষ। ওদিকেও হল না, এদিকেও হল না। যার কথায় ভুলে চলে গেলে তার সীমানা হল এই সোদপুর বাজার পর্যন্ত; সেও শেষ, তুমিও শেষ। আর ঐ যে লাইনটা, গন্ডিটা দিয়ে গেলাম, বলে গেলাম, গন্ডির বাইরে কিন্তু যেওনা 'মা', যতই যে আসুক। এমনই বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব যে, গন্ডির বাইরে তার যেতে হবে। যারজন্য রামায়নে বিরাট কান্ড হয়ে গেল। তোমাদের যে গন্ডিটা আমি বেঁধে দিয়ে গেলাম—আর কিছু না তোমাদের এমন কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই যে ২৪ ঘন্টায় একবার খাবে, আর খাবে না। তা নয়, শুধু কয়েকটি কথা—যে কথাগুলো, যা যা বলা হল সেগুলো পালন কর। অন্য কাজকর্ম যা কিছু করনা কেন বাঁধার কিছু নাই। শুধু সেই কয়টি কথা একেবারে ভিতর, হৃদয় স্থলে রেখে দেওয়া হবে। যত প্রলোভন, যত বিরুদ্ধ শক্তি এসে তোমাদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, ঐ গন্ডির বাইরে যাবে না; এই একটি কথা। আমি তো তখন উপস্থিত থাকতেছি না। আর তো কেউ বলিয়ে থাকবে না। শুধু বলা থাকবে ঐ লেখাটা সাবধান! সাবধান! ঐ সাবধান কথাটাই থাকবে। ব্যক্তি থাকবে না। রাস্তায় ব্যক্তি থাকে না, লেখা থাকে সাবধান! আস্তে চালাও, এখানে স্কুল আছে, এখানে কলেজ আছে, এখানে হাসপাতাল আছে, এখানে মোড় আছে, এইরকম লেখা থাকে। ঐ দেখে দেখে চলতে হয়। ঐটাই একমাত্র ইঙ্গিত। ঐটাও ঠিক সেইরকম। ঐ দেখে দেখে চলতে পারলে আর কিছু না, ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে।

আর মাঝে মাঝে যেভাবে ঠাকুরকে দেখতেছ, যেখাবে কথা বলতেছ, ঘরে বসে আছ, গল্প করতেছো, গল্পের মধ্যেই বাধামত গিয়া দাঁড়ায়ে গেলাম। গিয়া ডাক দিলাম— প্রফুল্ল। বললি— 'ঠাকুর'। এই তোর কাছে আসছিলাম, তোরা গল্প করছিলি, অসুবিধা হয় নাই তো? বয়, বয়। কথা বললাম—খেতে দে একটু কিছু। রান্না-বান্না করিস না, দেরী হয়ে যাবে; তখন তো আর ডায়াবেটিসের ভয় থাকবে না, আর ব্যাধি থাকবে না, যে ব্যাধির ভয়ে খাই নাই এতদিন। তখন এক পাত্র ভরে দিলেও খেয়ে নেওয়া যাবে। রসগোল্লা, পানতোয়া, লেডিকিনি খাইয়ে দিস। তখন বলব, নির্ভয়ে— এতদিন খাইনিরে প্রফুল্ল, এখন খেলাম। এখন আর ব্লাড সুগারের ভয় নাই। তখন কতকগুলো নির্দেশ দেব। তুই গিয়া মিতা-রে এই কথা বলবি, মঞ্জুকে এই কথা বলবি, কাবেরীকে এই কথা বলবি—এই রকম। ছেলেরা—এই কথা যে তোমার, এটা কি করে বুঝবে ওরা; আমি আবার তাদের জানিয়ে দেব যে এই কথা বলে এসেছি আমি। বেশিরভাগ সময়, মাঝে মাঝে—আমার টাইম হল রাত্রি ওটার সময় দেখা দেব। ওটার সময় ঐ একটা

সময়ে,টাইমে পাশ করব আমি। সেই সময় দু-একটা বাড়ি দেখা করে যাব। যারা ভয় পাবে দেখলে তাদের বাড়ি যাব না। যারা ভয় পাবে না, তাদের বাড়ি যাব। এলাম, দরজাটা ঠক্‌ঠক্‌ করলাম ঘরে ঢুকতে পারি এমনি, কিন্তু ঢুকবো না। ঠক্‌ঠক্‌ করে ঢুকবো। ঠক্‌ঠক্‌ করব।—"কে, কে" ?—"এই খোল"। গলার স্বর—গলার শব্দ শুনলেই বুঝতে পারবে আমি এসেছি। দরজা খুলে দেবে। একটা আসন রাইখা দিবা আমার লাইগা। আর একটা পাত্র রেখে দিও। রাত্রে এসে বলে দিয়ে যাব—কালকে এসে মিষ্টি খেয়ে যাব, আজ একগ্লাস জল খাব। এই কথা বলে দিয়া আসব। মিষ্টি রেখে দিবি। কার কার বাড়ি যাব, এখন কোন ঠিক নাই। মেয়েরা—এখন কি করবা এখনেরটা বলে দাও। এখনেরটা চিকিৎসা করবে—সেটা তোমাদের হাতে। যদি পার কর; তোমাদের হাতে আছে। আমার ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। চিকিৎসা শাস্ত্রে যত রকম যা আছে চেষ্টা কর, আমি রাজি আছি; অর্থ যা লাগবে দিতে রাজি আছি, সারানোটা তোমাদের হাতে। নিজেরা ৪/৫ জন ছেলেরা রইলো একত্র, মেয়েরা একত্র থাকবে। গুছায়ে-গাছায়ে থাকবা, গুছায়ে-গাছায়ে চলবা। তখন একবার গিয়া ইনশট্রাকশনটা দিয়া আসব, সব ঠিক রাখবা। তাড়াতাড়ি তখন যাতে দৌড়াদৌড়ি করতে না হয়। বেশিক্ষণ থাকা যাইবো না তো? তোদের জন্য মাঝে মাঝে খাবার নিয়া যাব। কেমন লাগে স্বাদ, দেখবি। শুনছোসতো কথাগুলো। মনে রেখো কথাগুলো, কোনরকম কন্‌সেপিরেসি, ষড়যন্ত্র, বুদ্ধিবাদ্দি কোনরকম কিছু থাকবে না। যা বলি সেইভাবে কাজ করবে। মামুলি ঠাকুর পাস নাই। মনে রাখিস কথাগুলো। যেমন কবো, সেইভাবে চলবা। যেইভাবে চালাবো, সেইভাবে চলবা। যাওয়ার সময়তো নিয়ে যাব তখন যাতে বলতে পারি, তখন যাতে কানে কানে কথা কইতে পারি এই করবি, ঐ করবি। সব শুনবি, ভয় পাবি না, কিছু কবি না। চিকিৎসার কথা রবিন আছে, এরা আছে, প্রফুল্ল আছে, ওদের কাছে জেনে নেবে। মেয়েরা— তোমার অসুখ প্রতিবার তো তুমিই সারাও, ডাক্তারতো কিছু করতে পারে না। এখন আধ ঘন্টা পর পর প্রস্রাব পাচ্ছে, একেবারে ব্রীক রেড কালার। যখন প্রস্রাব বন্ধ হবে—প্রস্রাব বন্ধ মানেই....। জানিয়ে দিলাম।আর কথা হল— আমি যদি কখনও কোন নির্দেশ দেই— আমি যদি কখনও গেলাম, টেপ রেকর্ডার যদি রাইখা দাও, একটা টেপ সেট রেডি রেখে দিবা—যেই কথা বলব ছাইরা দিবা। ঐ কথাগুলো সেই থেকে রেকর্ড করে চারিদিকে ছেড়ে দেবে। আমি তারিখ দিয়া কথা বলব। সাল তারিখ দিয়া কথা বলব যে, আজআমি এলাম। বুঝতে পারবে আগের কথা যদি বলা হয় আমি এমন কথা বলব—যে ঘটনাটা ঘটে গেছে আবার পরে যেটা ঘটছে সেটা যদি মুখ দিয়ে বলি তবেতো তোমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। একখানা ক্যামেরা রেখে দিও। ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলে রেখে দিও; জামা

কাপড় রাইখো। খালি গায়ে যদি এসে পরি, জামা - কাপড় দেবে। অনেক ফ্যাসিলিটি আমার আছে। অনেক ফ্যাসিলিটি প্রকৃতি আমাকে দেবেন। সেটা যে পর্যন্ত আমি ব্যবহার করতে পারি সেই বর্যন্ত ব্যবহার করবো। তারচেয়ে বেশি ব্যবহার করব না। তোমাদের নিয়েই ফটো তুলবো। সেটা যে আগের নয়, এটা তোমরা সেইভাবে বুঝিয়ে দিও।সেইভাবে তোমরা চলবা, যাতে প্রমাণ করতে পার এটা হালের ফটো, আগের নয়। সকলে যাতে বিশ্বাস করে। পত্রিকা যদি দাও আমার হাতে একটা পত্রিকা যুগান্তর পত্রিকা—আনন্দবাজার পত্রিকা যদি দাও আমার হাতে, খবরগুলো দেখতেছি, সেটাই যথেষ্ট। এটা তোমাদের নিজেদের জন্য। এগুলো নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেবে। আর নাম-গান-কীর্ত্তন ঠিকমতন চালিয়ে যাবে। কখনও প্রসেশনের মধ্যে মাঝে মাঝেই এই চেহারায় কিংবা অন্য চেহারায় এসে পড়তে পারি। বেশিরভাগ সময়টাই কাটব এই পরিবেশেই কাটাব —বলে দেব এই প্রসেশনে আমি যাব তোমরা প্রসেশন কর আমি থাকব ; আমি ঠিক যাব। সবরকমই জানিয়ে দিলাম, প্রস্তুত থেকো সব সময়। ছেলেরা—দেশের অবস্থা চেঞ্জ করার পরের ঘটনা তো এইগুলো। পরিবর্তন যাতে হয় তারজন্য। সময় করে যাতে নামতে পারি যাতে পরিবর্তনটা হয়, তারজন্যই এই ব্যবস্থা। প্রত্যেকে হৃদ্যতা রেখে গুড সার্ভিস দিয়ে যাবে। ছেলেরা শাখা সংগঠনগুলো এতদিন তোমার নির্দেশে চলত এখন কি হবে ? সবসময় তো আমি নির্দেশ দিতে পারবনা। আমি কিছুটা নির্দেশ দিয়ে যাব। এই রবীনের কাছে, রায়ের কাছে বলে যাব। এই সব কথাগুলো শুনলে সিরিয়াস হয়ে যাবে সবাই। মেয়েদের কান্না—আমাদের ক্ষমা কর। তোমাদের সবাইকে আমি নিয়ে যাব।আমার কাছ ছাড়া কাউকেই আমি করব না। এটা আমার একেবারে বদ্ধমূল করে নিয়েছি। আমি এতদিন যে পরিশ্রম করলাম— কত মান অপমান শিশু বয়স থেকে বহু দুঃখ-কষ্ঠ , আঘাত-প্রতিঘাতের ভীতর দিয়ে চলেছি। কোন অবস্থায় কার উপর রাগ অভিমান করি নাই। যে যা খুশি যা বলেছে, সেটা আমি মাথা পেতে নিয়েছি। কাউকে বিরক্ত করি নাই, কারও উপর রাগ করি নাই, হিংসা বলে কিছু আমি জানি না। যার যার করার, গোপনে বলে দিয়েছি; প্রয়োজনে শাসন করেছি। প্রচুর অর্থ আমার কাছ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে, কোন অর্থই আমি ধরে রাখি নাই। শিশু বয়স থেকেই পাকা চুল বাছা থেকে পয়সা রোজগার করেছি। গা ম্যাসেজ করে পয়সা রোজগার করেছি। শিষ্যদের আইঠা পরিস্কার করেছি। এখন আর পারি না। অন্তরজ্বালা, প্রেম ভালোবাসা দিয়ে তোমাদের মানুষ করেছি। কোনরকম ব্যতিক্রম করি নাই। প্রস্রাব যে করব একেবারে লাল আগুনের মতো। এই আগুনগুলো যদি ভিতের থাকত তবে শরীরটা তো আগুনের মত থাকত। এই অবস্থায় হাসপাতালে ডেথ বেডে থাকে। ঠাকুর তোমাদের সাথে কথা বলছে। ডাক্তার অবাক হয়ে

গেছে। এই রকম সুগার যাচ্ছে ৪০০ প্রায় ব্লাড সুগার নিয়ে যে কেউ কথা বলতে পারে এটা ভাবতে পারা যায় না। আর আমি নর্মাল ভাবে কথা বলছি। প্রত্যেকটা ডিলিংস, বিহেভিয়ার, কথাবার্তা, যেখানে যা দরকার। 'একটা ওয়ার্নিং চলছে তো। সবাই যদি না জানে, সবাই বলবে কিছু বলে গেল না; কিছু করে গেল না। টাকা-পয়সা যা আছে অর্গানাইজেশনের, সেগুলো তোমরা খরচা করবে; সেইভাবে তোমরা গুছাবে অর্গানাইজেশন যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করবে।' কেউ কারো নিন্দা আলোচনা-সমালোচনা করবে না। প্রত্যেকে যে যা বলবে, মনযোগ দিয়ে শুনবে, মনযোগ দিয়ে করবে। আঘাত দিয়ে, ঝাড়া দিয়ে কথাই বলবে না। আমি আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করব। মাঝে মাঝে এসে হানা দেব। মাঝে মাঝে আমি অন্য রূপেও আসতে পারি। কিন্তু কথা হল, আদেশের অমান্য করবে না। আদেশের বাইরে তোমরা কেউ চলতে পারবে না। দিনগুলো শুধু কাটাবে প্লাটফর্ম-এর মত। আমি যখন চলে যাব, দিনগুলো কাটাবে প্লাটফর্মের মত। কখন কারে পাঠায়ে দিই কারে নেবার জন্য ঠিক নাই, বলে দিলাম। এনিটাইম যেকোন মুহূর্তে আমার মনে হল, প্রফুল্লকে নিয়ে যেতে হবে, ওকে নিয়ে যেতে হবে, নিয়ে যাব। তারজন্য ওয়েট করবো না। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র কারো জন্য ওয়েট করবো না। ফট করে নিয়ে চলে যাব। কথার কথা বলছি। আর যদি শরীর ভালো হয়ে যায়—তাহলে আবার পাঁচ বছর যাবে গিয়ে। সব রকম কথা বলছি।

তোমরা পাঁচ-দশ বছর রেখে দিতে পার। আমার কোন আপত্তি নাই। আমি যাবার জন্য উদগ্রীব নই। আইনে আছে তুমি যাবার জন্য উদগ্রীব হতে পারবে না। বাঁচবার জন্য তুমি বাস্তব চেষ্টা সবার কাছে ছেড়ে দেবে। তারা যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারে সেখানে তুমি আপত্তি করতে পারবে না। দশ-পনেরো বছর যদি টিকিয়ে রাখতে পার রেখে দিও। আইন যখন আছে, তোমরা রেখে দিতে পার। এটা না যে, আমি চলে যেতে চাই তোমাদের ফাঁকি দিয়ে। আমি আপত্তি করব না। আর যদি তোমরা রাখাতে না পার, ঔষধ যদি না ধরে, আমি নিজের দৈব খরচা করে কিছু করব না। শেষ যাওয়া পর্যন্ত নিজের রেকর্ড নষ্ট করে একচুল এদিক ওদিক করবো না। পরিস্কার রেকর্ড আমি খারাপ করব না। তোমাদের জন্য শেষ রেকর্ডটা যেন ঠিক থাকে। কোনদিন আমি শান্তি কামনা করি নাই এইজন্য। তবু জেনো দেহের রেকর্ড এখানকার আমার হাতে না। সবরকমই বললাম। আমি থাকতে চাই। থাকায় আমার কোন আপত্তি নাই। পনেরো বছর রাখো, আমি ঠিক থাকতে রাজি আছি। আর একজনকে সুস্থ করার জন্য যা করার দরকার, তা আমি করতে পারব। কিন্তু আমার নিজের জন্য বলবে না। আমার একার ওপর লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শুধু এখানকার নয় ইউনিভার্সের অনেক জায়গায় অনেকে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সবাই আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেরে প্রফুল্ল।

সুতরাং রেকর্ডটা আমি খারাপ করতে রাজী না। শেষ বেলায় গিয়ে কোলার বাখলায় আছাড় খাব। এতকাল রেকর্ডটা ঠিক রাখলাম—এইটাই আমার লাষ্ট পরীক্ষা। কিন্তু আমার যেন সেই প্রত্যাশা, আশা আকাঙ্খা জেগে না যায়। যায়না বলে ভাল আছি। শেষ রেকর্ডটা যেন ঠিক রাখতে পারি। তোমাদের জানিয়ে গেলাম। প্রেসার দিও না। তোমারদের কান্না, দুঃখ-ব্যথা আমার তো লাগে! রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে তো এসেছি। আমাকে লাগায়না। মানুষ এখানেইতো Fall করে (পতন হয়), আমাকে সেই দিকে নিওনা। আমাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর। আমি যাতে রক্ষা পাই তার চেষ্টা কর। যদি বাঁচিয়ে তুলতে পার রাজি আছি।

সুখচর
১২-০৯-১৯৯২ (রাত্রিবেলা, চাতালে)

যার প্রতি যে আদেশ থাকবে সেইভাবেই সে যেন চলে। এই কথাটা তোমরা মনে রাখবে। আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে কখন কি হয়, কিচ্ছু বলা যায় না। এতো হাই সুগার চলছে, কতো ডাক্তার দেখানো হল কিন্তু দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছে, উন্নতি আর দেখছি না। তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এইসব করতে যাবে না, একে অপরকে হিংসা করবে না। সেই শিশু বয়স থেকে একটানা আমি কাজ করে চলেছি, কোনো অবস্থাতেই আমাকে টলাতে পারেনি। কতো অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। নিন্দা বদনাম অপবাদ-একেবারে সুপ্রীম কোর্টের কেস পর্যন্ত যেতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই শিশু বয়স থেকে যে পথের সন্ধান পেয়েছি সেই পথের থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারেনি। তাই মনে হয় যে কাজের জন্য আমার আসা সেই কাজের success-এর একটা সুর ভেসে আসছে। আর আমার success হওয়া মানে তোমাদেরও success, কারণ তখন তোমাদের গতি কি হবে সেই বিষয়ে আমি ছাড়া অন্য কেউ বলার থাকবে না। এই success-টা যে কতো বড় ব্যাপার সেটা এখন তোমরা বুঝতে পারবে না। যারা চলে গেছে তারা কিছুটা বুঝতে পারছে। এতোবড় মহাবিশ্বের এতো বিশাল ব্যাপার চলছে, কেউ যদি একটু খেয়াল করে চলে তবে অবাক হয়ে যাবে।

মিনু—ঠাকুর! এই যে দ্বিজুকাকু কিছুদিন আগে চলে গেলো ও কোথায় আছে? দ্বিজুকাকু এখন তোমাকে বুঝতে পারছে?

পরমপিতা—যারা চলে গেছে তারা আমাকে বেশী বোঝে।

মিনু—দ্বিজুকাকু কি মুক্তি পেয়ে গেছে?

পরমপিতা—এটা তো তোমাদের জানানোর বিষয় নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি

ধর্ম ও বিজ্ঞান
একেই কি বলে সভ্যতা ?
আমার বাবা আমার ঠাকুর
আলোর যুগ